পটচিত্র : একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা

মুনমুন বন্দ্যোপাধ্যায়

ড. চিত্তরঞ্জন মাইতির লেখনী থেকে জানা যায় যে পটচিত্রকলা Formalized Folklore-এর অন্তর্গত। কারণ এই শৈলী প্রধানত বাক্যাশ্রয়ী ও শিল্পাশ্রয়ী উভয় বিষয় নিয়েই গড়ে ওঠে।[১] তবে স্থান বিশেষে ব্যতিক্রমও লক্ষণীয়। যেমন—কালীঘাট পটচিত্রের কথা বলা যেতে পারে, যা মূলত শিল্পাশ্রয়ী। 'পট' শব্দটি সংস্কৃত 'পট্ট' বা 'পট' থেকে আগত, যার অর্থ কাপড় বা বস্ত্রখণ্ড। সুনীল চক্রবর্তী তাঁর 'লোকায়ত বাংলা'-তে পট সম্পর্কে বলেছেন যে প্রাক-আর্য-আগমনকালীন পটশিল্পের নামরূপ আর্য যুগে প্রচলিত ছিল। আর্য পূর্ববর্তী দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাবর্গে তার সন্ধান পাওয়া যায়। সংস্কৃত নাটকের প্রাকৃত অংশে 'পডম' শব্দের প্রয়োগও দেখা যায়। অতএব সংস্কৃত 'পট্ট' নয়, দ্রাবিড় 'পডম' থেকেই বাংলায় পট শব্দের উদ্ভব ঘটেছে[২]। পটের প্রচলন কবে থেকে তা নির্ধারণ করা কঠিন। তবে হর্ষচরিত, উত্তররামচরিত, মালবিকাগ্নিমিত্রম্, অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, মুদ্রারাক্ষস, হরিবংশপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে পটের উল্লেখ দেখা যায়।[৩]

বাংলায় যাঁরা পট আঁকেন তাঁরা হলেন পটুয়া-চিত্রকর সম্প্রদায়। এই জাতি সম্প্রদায় না হিন্দু না মুসলমান। তাঁরা দুই ধর্মের সন্ধিক্ষণে বিরাজ করেন এবং হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই আচার অনুষ্ঠান পালন করে থাকেন। বিশেষজ্ঞদের মতে ধর্মীয় ভাবনা থেকেই পটচিত্রের উদ্ভাবন। তবে ধর্মীয় চেতনার থেকেও বর্তমানে পণ্য হিসেবে তা বেশি পরিগণিত হচ্ছে। ওয়াকিল আহমেদের লেখনীতে উল্লিখিত গুরুসদয় দত্তের উক্তি থেকে জানা যায় যে, পটুয়ারা দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার বংশধর। মহাদেবের বিনা অনুমতিতে ছবি এঁকেছিলেন বলে মহাদেবের অভিশাপে তাঁরা সমাজের নিচু স্তরভুক্ত হয়ে পরেন। অভিশাপের ফলে তাঁরা হিন্দুও হলেন না, আবার মুসলমানও হলেন না। তাঁরা মুসলমানী রীতিনীতি মানতে লাগলেন ও হিন্দুদের কাজ অর্থাৎ ছবি আঁকতে থাকলেন।[৪] এঁদের একটি হিন্দু নামের পাশাপাশি একটি মুসলমান নামও থাকে। তবে এঁদের সকলের পদবি বেশিরভাগই চিত্রকর। এঁদের বিবাহ নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যেই হয়ে থাকে। বিবাহে মৌলবি এসে ইসলাম ধর্মমতে কলমা পড়িয়ে যান, আবার হিন্দু রীতি মেনে গায়ে হলুদ, সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে শাঁখা পরানোর রীতিও বর্তমান। পুত্র সন্তানের অন্নপ্রাশনে যেমন ইসলাম ধর্মমতানুযায়ী সুন্নত করার প্রথা প্রচলিত তেমনই হিন্দু মতে জামাইষষ্ঠীর আচারও এঁরা পালন করে থাকেন। ইসলামকে মানার পাশাপাশি এঁরা হিন্দু দেবদেবীর অবয়বও চিত্রিত করে থাকেন। একদা এঁরা গ্রামে ঘুরে ঘুরে পট দেখিয়ে, গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। পটুয়া বাড়ির মেয়ে-বউরা মাটির পুতুলও তৈরি করে থাকেন। সামগ্রিক

ভাবে আকারগত দিক থেকে পটুয়ারা দু'ধরনের পট তৈরি করে থাকেন। প্রথমটি দীঘল বা জড়ানো পট, যা লম্বালম্বিভাবে জড়ানো থাকে। এটি যখন আড়াআড়ি ভাবে জড়ানো থাকে তখন তার নাম হয় আড়ে-লাটাই পট। দ্বিতীয়টি হলো চৌকো পট। যেমন, চক্ষুদান পট, অধুনালুপ্ত কালীঘাট পট ইত্যাদি।

জড়ানো পটের ক্ষেত্রে মুলত কাগজের সঙ্গে কাগজ জুড়ে জুড়ে পটের ক্ষেত্র তৈরি করা হয়। তারপর তাকে মজবুত করার জন্য তার পিছনে পুরাতন সুতির কাপড় বা ধুতি আটকানো হয়। এরপর পটের দু'প্রান্তে দুটি কাঠি লাগানো হয়, যা ধরে পটটি খোলা ও গোটানো হবে। পট দেখানোর সঙ্গে সঙ্গেই চলে ছবির ঘটনানুযায়ী গান এবং এরই সঙ্গে জড়ানো পটের ক্ষেত্রে একেকটি ঘটনাধর্মী ছবির সাপেক্ষে পটের জড়ানো অংশ খুলতে থাকে।

পট আঁকার জন্য মুলত ভেষজ রঙ ব্যবহার করা হয়। ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে জানা গেছে যে, পটুয়ারা লাল রঙের জন্য আলতা, সিঁদুর, লটকন ফল, উনানের গায়ের পোড়ামাটি অথবা লাল গেঁড়িমাটি, নীলের জন্য অপরাজিতা ও তুঁতে, হলুদের জন্য কাঁচা হলুদ, গাঁদাফুল, এলামাটি ইত্যাদি। সবুজের জন্য শিমপাতা, হিঞ্চে পাতা, বেলপাতার রস, বেগুনির জন্য জাম অথবা পুঁইমিটুলির রস, সাদার জন্য চকখড়ি, শাঁখের গুঁড়ো, ঘুসুং, খয়েরির জন্য চুন অথবা এলামাটির সঙ্গে খয়ের, ধূসর রঙের জন্য উনানের ছাই, কালো রঙের জন্য পোড়া হাঁড়ির তলার ভুসোকালি অথবা গাব গাছের শিকড় পুড়িয়ে কালো রং তৈরি করে থাকেন। বর্তমানে গাড়ির সাইলেন্সারে জমা হওয়া ভুসোকালি থেকেও তাঁরা কালো বানান। তবে এখন ভেষজ রঙের বদলে বাজার চাহিদানুযায়ী বাজার চলতি গুঁড়ো রং, অ্যাক্রেলিক রং তাঁরা ব্যবহার করেন। রঙের বাঁধনের জন্য বেলের আঠা, তেঁতুল বিচির কাঁই, নিমের আঠা ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। সম্প্রতি সিন্থেটিক অ্যাডেসিভ জাতীয় আঠাও ব্যবহৃত হচ্ছে। ভেষজ রঙের ক্ষেত্রে পোকা লাগার সমস্যা থেকে নিষ্কৃতি পেতে রঙের সঙ্গে তুঁতে মিশিয়ে নেওয়া হয়। পটুয়া-চিত্রকরেরা পট আঁকার জন্য পশুর লোমের তুলি এবং রং গোলার পাত্র হিসেবে নারকেল মালার ব্যবহার করে থাকেন। পূর্বে পট আঁকার জন্য তুলোট কাগজের ব্যবহার করা হলেও বর্তমানে মোটা সাদা কাগজ বা আর্ট পেপারের ব্যবহার করা হচ্ছে। শিল্পীরা সমতলীয় পট আঁকার সময় রেখা দিয়ে প্রথমে খসড়া এঁকে তারপর সমতলীয় রং দিয়ে দৃশ্যানুযায়ী চিত্রপট ভরাট করেন। তারপর পটুয়াদের বলিষ্ঠ ছন্দময় রেখার টানে-টোনে সহজ সরল ভাবে ছবিটিকে ফুটিয়ে তোলা হয়। পটের সংরচনায় কোনো গভীরতা দেখা যায় না। সম্পূর্ণ চিত্রপটই সমতলীয় এবং দ্বিমাত্রিক গুণসমৃদ্ধ। পটের পশ্চাদপট কখনও সাদা কখনও রঙিনও হয়ে থাকে। তবে দেহাবয়বের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার লক্ষণীয়। প্রতিটি অবয়বের মধ্যে একটি অভিব্যক্তিও লক্ষ করা যায়। সাধারণত পটের চারপাশে ফুল-লতা-পাতার সীমানা নির্ধারক নকশাময় ফ্রেম চিত্রিত হয়ে থাকে।

যাইহোক, ধর্মের সাপেক্ষে সামগ্রিক ভাবে দুই ধরনের পট দেখা যায়। একটি ধর্মীয় ও অন্যটি ধর্ম নিরপেক্ষ। ধর্মীয় পটের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, আদিবাসীদের নানান ধর্মীয় আখ্যান ও কাহিনিমুলক পট চোখে পরে। যেমন রামের বনবাস ও সীতাহরণকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা রাবণবধবিষয়ক পটের কথা বলা যেতে পারে। এছাড়া ধর্ম বিষয়ক কৃষ্ণমঙ্গল, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, সাবিত্রী-সত্যবান উপাখ্যান, দুর্গাপটও দেখা যায়। পটের মধ্যে

বিনোদনের প্রবণতা থাকলেও পটের মাধ্যমে পুরাণাশ্রয়ী দেবদেবীরা সাধারণ গৃহস্থের অংশ রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এগুলির মধ্য দিয়েই আবার তাঁরা সমাজ সচেতনতাকে জাগিয়ে তুলেছেন। ফলত শিব, দুর্গা, গাজি পির, মেরি অথবা মারাংবুরু, সকলের লক্ষ্য এক, ভাষা এক। তাঁদের কাছে যিনি মুসলমান সমাজের সত্যপির তিনিই আবার হিন্দুকুলের সত্যনারায়ণ। আবার ঐতিহাসিক বিভিন্ন ঘটনা, সমাজ সচেতনতামূলক বিষয়, প্রতিবাদী মনোভাবাপন্ন বিষয়ক পটও দেখা যায় যা ধর্মনিরপেক্ষ পটের আওতাভুক্ত। বর্তমানে সমসাময়িক বিষয়ক যেমন কন্যাশ্রী, স্বচ্ছ ভারত অভিযান, নির্ভয়া কাণ্ড, সুনামী, সুভাষের জন্ম, রবীন্দ্রনাথের জন্ম, কাকদ্বীপের জাহাজ ডুবি ইত্যাদি বিষয়ক পট দেখা যায়। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া আম্ফান ঝড় ও করোনা মহামারীকে কেন্দ্র করেও শিল্পীরা পট তৈরি করছেন ও পটের গান বেঁধেছেন।

পটুয়ারা আবার সাঁওতালদের জন্মকাহিনিকে কেন্দ্র করে প্রচলিত উপকথা ওরফে 'কো রিয়াক কথা' নামে পট এঁকে থাকেন। সাধারণত পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুরে দেখা যায়। সাঁওতাল পট দু'ধরনের, একটি পৌরাণিক ও অন্যটি পারলৌকিক পট। পৌরাণিকের মধ্যে জমসীন-বিনতির পট, মারাংবুরু, লিটাগটেৎ ও জাহের-এরাকে পট এবং পারলৌকিকের মধ্যে মারাংবুরুর শাস্তিদান, মহারাজাপট, চক্ষুদান পট ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সাঁওতাল উপজাতিদের 'চক্ষুদান পট' একটি উল্লেখযোগ্য পট। এটি জড়ানো ও চৌকো দু'ভাবেই দেখতে পাওয়া যায়। সাঁওতাল পরিবারে কেউ মারা গেলে মৃতের আদলে একটি কল্পিত পট এঁকে পরিবারের সদস্যদের কাছে এসে বলা হয় যে মৃত ব্যক্তির ছবিতে চক্ষুতারকা না আঁকলে সে পরলোকে কষ্ট পাবে। তাই তাঁর স্বজনদের কাছে টাকাপয়সা, জিনিসপত্র ইত্যাদি নিয়ে তার পরিবর্তে সেই পটে চোখের তারা এঁকে মৃত ব্যক্তির আত্মার মুক্তি দেন পটুয়ারা। এই পটই চক্ষুদান পট নামে পরিচিত।[৫]

আরেক ধরনের পট হলো যমপট, যেখানে নরক-যন্ত্রণার ভয়ানক দৃশ্য আঁকা হয়। মানুষের ইহজগতে কোনো নেতিবাচক কাজ করলে পরলোকে গিয়ে তার শাস্তিস্বরূপ কি ধরনের নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, সে সম্পর্কে মানুষকে ভয় দেখাতে ও সচেতন করতে এই পট আঁকা হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পটে কালদূত ও কৃষ্ণদূত নামে যে দুই প্রহরীর ছবি আঁকা হয় তারা হলো বিবেকের প্রহরী। একার্থে তাঁরাই হলেন পটুয়ারা, যাঁরা এই পাপ-পুণ্যের ফলাফলের ছবি এঁকে মানুষকে সচেতন করছেন।[৬] লৌকিক আখ্যানধর্মী গাজিপটে মুসলমান ধর্মযোদ্ধা ও গাজিপিরদের বীরত্বের কাহিনি অঙ্কিত হয়েছে।

বর্তমানে মেদিনীপুর অঞ্চলে একজন বয়োজ্যেষ্ঠ শিল্পী তাঁর নিজের জন্মকাহিনি নিয়ে গান রচনা করে পট এঁকেছেন। অঞ্চলভেদে পটুয়াদের এই পটের মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষণীয়। যেমন, বীরভূমের পটের জমিন বা পশ্চাদপটে লাল রঙের ব্যবহার দেখা যায়। এগুলির অলংকরণও অনেক বেশি। লালের ব্যবহার বীরভূম ছাড়াও বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদেও দেখা যায়। মেদিনীপুরের পটের অবয়বের ক্ষেত্রে পুতুলের আকারের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। মুর্শিদাবাদ, বীরভূমের পটের মতো অর্ধনির্মীলিত স্বপ্নালু চোখ এখানে দেখা যায় না। এখানকার পটে সবুজ ও হলুদ রঙের প্রাধান্য বেশি। পুরুলিয়ার পটে আবার খয়েরি রঙের প্রাধান্য চোখে পরে। পশ্চাদপটে সাদার ব্যবহারও দেখা যায়। তবে এক্ষেত্রে অলংকরণ সেভাবে লক্ষণীয় নয়।

অবয়বগুলি প্রোফাইলে বা পাশ থেকে আঁকা। উজ্জ্বল রঙের বৈচিত্র্যও ধরা পরে।

চৌকোপটের ক্ষেত্রে কালীঘাট পটের কথাই সর্বাগ্রে উঠে আসে। কালীঘাট পটে দেবদেবীর ছবির সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন বঙ্গসমাজের বাবু-বিবির কীর্তিকলাপ, গোলাপ সুন্দরী, বীণাবাদিনী ইত্যাদি পটও দেখা যায়। এগুলি যথেষ্ট ইন্দ্রিয়োদ্দীপক। পটের অবয়বের দেহ সৌষ্ঠবেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই পটের চিত্রণে ইউরোপীয় জলরঙের প্রভাবও বর্তমান ছিল।

ঋণস্বীকার, ট্রাইবাল আর্টস শীর্ষক প্রদর্শনী, আইসিসিআর, কোলকাতা, জুলাই ২০১৯

বিষ্ণুপুরের দুর্গাপট চৌকো পটের আওতাভুক্ত। তার আকারগত বিশিষ্টতা লক্ষণীয়। দুর্গাপট আবার ঠাকুরানি পট বা দরবারি পট নামেও পরিচিত। এটি বিষ্ণুপুরের শাঁখারিপাড়ার ফৌজদাররা তৈরি করে থাকেন।[৭] বীরভূমের হাটসেরান্দী অঞ্চলেও দুর্গাপটের আকারগত ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। সেখানে বাঁশের চালি বানিয়ে, তাতে কাদা-মাটির জলে ডোবানো কাপড় সেঁটে দেওয়া হয়। তা শুকিয়ে গেলে খড়িমাটির প্রলেপ দিয়ে জমিন তৈরি করা হয়। তারপর দুর্গাপরিবার আঁকা হয়। পটের পশ্চাদভূমি নীল এবং দেবদেবীর গায়ের রঙ হলুদ। এই পটের ক্ষেত্রেও তেঁতুলবিচির আঠা ব্যবহৃত হয়। এই পটের বিশেষত্ব এই যে এখানে সোনালী ও রূপালি চুমকীর অলংকরণ করা হয়ে থাকে। এই পটও সম্পূর্ণ দ্বিমাত্রিক। পটের উপরের দিকে একই জমির উপর চালচিত্রও আঁকা হয়ে থাকে। এই গ্রামে খুব আড়ম্বরতার সঙ্গে পটের দুর্গার আরাধনা করা হয়। এখানকার শিল্পীরা বড়ো বড়ো প্রতিমাও গড়েন, আবার অবসর সময়ে চাষাবাদের কাজও করে থাকেন। ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে জানা যায় যে, হাটসেরান্দী গ্রামে বর্তমানে দুই-তিন শিল্পী পরিবারের সদস্যরা বংশপরম্পরায় এই দুর্গাপট তৈরি করছেন।

উত্তরবঙ্গের মালাকার সম্প্রদায় মনসা ও ষষ্ঠীর পুজো উপলক্ষ্যে একধরনের শোলার পাতের উপর আঁকা রঙিন পট বানিয়ে থাকেন, যা মালিপট নামে পরিচিত। এগুলি দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক আকারবিশিষ্ট। ত্রিমাত্রিক চৌডোলগুলি মূলত চতুর্ভূজ ও বৃত্তাকার হয়ে থাকে এবং এগুলিকে ঝুলিয়ে রাখা হয়। ষষ্ঠীপুজো উপলক্ষ্যে তৈরি পট ষাইটোরী মাওএর ডোলা বা ষাইটোল এবং মনসাপুজো উপলক্ষ্যে যে চৌডোলগুলি বানানো হয় সেগুলি বিষহরি পট নামে পরিচিত।[৮] সহজ সরল রেখার ব্যবহার ও উপস্থাপনাই-এর মূল বৈশিষ্ট্য।

পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত উড়িষ্যার রঘুরাজপুরের পটচিত্র একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। মূলত উচ্চ আলঙ্কারিক গুনাগুণ বিশিষ্ট জগন্নাথ কেন্দ্রিক এই পট কাগজ ও কাপড়ের উপর রং-তুলি দিয়ে আঁকা হয়। এছাড়া এখানে তালপাতার উপর স্টাইলাসের সাহায্যে খোদাই করেও পট আঁকা হয়। এই পটের বিষয় হিসেবে রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণলীলা, দশাবতারসমূহ ও অন্যান্য

দেবদেবীরাই বিশেষ প্রাধান্য পান। অঙ্কিত পটগুলির চারধারে বর্ণময় আলংকারিক ফুল-লতা-পাতা ও জ্যামিতিক আকার বিশিষ্ট ফ্রেম দেখা যায়। রঘুরাজপুরের চিত্রকর সম্প্রদায় এই পট আঁকেন।[৯] অন্ধ্রপ্রদেশের চেড়িয়ালের জড়ানো পট 'চেড়িয়াল পট' নামে পরিচিত যা কাপড়ের উপর আঁকা হয়। এগুলিতে নানারকম পৌরাণিক ও আখ্যানমূলক কাহিনি বর্ণিত হতে দেখা যায়। তেলেঙ্গানাতেও হিন্দু পৌরাণিক কাহিনিকে কেন্দ্র করে কাপড়ের উপর পট আঁকা হয়। লম্বাটে পটে গল্পগুলি আনুভূমিক ভাবে আঁকা হয় এবং ফুল-লতা-পাতার ফ্রেমের সাহায্যে প্রতিটি ঘটনাকে পৃথক করা হয়।[১০] বিহারের মধুবনী ও মহারাষ্ট্রের ওয়ারলি ঐতিহ্যগত ভাবে দেওয়ালচিত্র হলেও বর্তমানে কাগজ ও কাপড়ের পটেও আঁকা হচ্ছে।

পটচিত্র একটি বিশেষ লোকশিল্প শৈলী হলেও এঁকে কেন্দ্র করেই অন্যান্য সমসাময়িক পরিশীলিত শিল্পীরা নিজেদের শৈলী নির্মাণ করেছেন। যেমন, যামিনী রায়, লালুপ্রসাদ সাউ, সনৎ কর প্রমুখের কাজে পটচিত্র শৈলীর প্রভাব লক্ষণীয়। পূর্বে পটচিত্রকে নিম্নমানের বলে চিহ্নিত করা হলেও আজ তা সমস্ত বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়েছে। পটচিত্র-শিল্পীরা বর্তমানে তাঁদের সৃষ্টিকে নিয়ে বিভিন্ন মেলায়, কর্মশালায় ইত্যাদিতে যোগদান করার পাশাপাশি বিদেশেও পাড়ি দিচ্ছেন। তাঁরা পরিশীলিত শিল্পীদের সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে ছবি আঁকছেন এবং তা সসম্মানে আর্ট গ্যালারীগুলিতে স্থানও পাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে মেদিনীপুরের স্বর্ণ চিত্রকর, বীরভূমের কালাম পটুয়া প্রমুখের কথা বলা যেতে পারে। বর্তমানে পটচিত্র শৈলী শুধুমাত্র পটেই সীমাবদ্ধ নেই, বরং সেগুলি নানাবিধ বস্ত্র-পরিচ্ছদে, নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রীতে, ঘর সাজানোর সামগ্রীতে, গয়নায়, বিবাহের নিমন্ত্রণপত্রে প্রভৃতি স্থানে ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে পটচিত্র বিভিন্ন থিম ভিত্তিক পুজোর একটি জনপ্রিয় উপাদানে পরিণত হয়েছে। নিজেদের শিল্পসৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখতে বর্তমানে বাজার চাহিদানুযায়ী শিল্পীরা পটচিত্রের এই বহুমুখী উপস্থাপনের দিকে ঝুঁকেছেন। তবে পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ কয়েকটি জায়গা ছাড়া বহুস্থানেই আজ পটচিত্র অঙ্কনের ধারা লুপ্ত হয়ে গেছে। তবে মেদিনীপুরের নয়া এবং পিংলার ন্যায় বেশকিছু স্থানের পটচিত্রশিল্পীরা সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সহায়তায় নানাভাবে প্রচারের আলোকে এসেছেন এবং নিজেদেরকে বর্তমান সমাজে টিকিয়ে রাখতে পেরেছেন। তাঁদের সৃষ্টি বিশ্ব-দরবারে আজ স্থান করে নিয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

উৎসের সন্ধানে

১. চিত্তরঞ্জন মাইতি : প্রসঙ্গ : পট, পটুয়া ও পটুয়া সংগীত, কোলকাতা, সাহিত্যলোক, ২০০১, পৃ. ২১

২. ভোলানাথ ভট্টাচার্য : পট ও পটুয়া-কথা এবং অন্যান্য কথামালা, কোলকাতা, বিপত্তর.ইন, ২০১৭, পৃ. ১৩-১৪

৩. তদেব : পৃ. ১৭

৪. ওয়াকিল আহমেদ : 'বাংলার লোক-সংস্কৃতি', ঢাকা ২, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৫, পৃ. ৭৮

৫. সুহৃদ কুমার ভৌমিক : 'আদিবাসীদের জড়ানো পট : বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-মেদিনীপুর', পশ্চিমবঙ্গের পটচিত্র, অশোক ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কোলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র,

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০১৭, পৃ. ২০
৬. অগ্নিমিত্র ঘোষ : 'বীরভূমের পটচিত্র ও চিত্রকর', পশ্চিমবঙ্গের পটচিত্র, অশোক ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কোলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০১৭, পৃ. ২৩
৭. বিধান বিশ্বাস : 'ঠাকুরানি পট', লোকশ্রুতি, মালিনী ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য সম্পাদিত, ইস্যু ১, ভলিউম ৫, কোলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ডিসেম্বর ২০০৬, পৃ. ৫৭
৮. Shola the Wonder Wood, Kolkata : Sola Craft, Consulate General of the Federal Republic of Germany & Banglanatak.com, 2019, p.49-51
৯. Aditi Ranjan : M P Ranjan (Eds.), Crafts of India Handmade in India, Council of Handicraft Development Corporations (COHANDS), New Delhi, Reprinted 2014, p.211-212
১০. Ibid, p.276

সুতো, পেপার, রঙ এতে ব্যবহৃত হয়। মূলত পাথর বসানোর কাজই এই জরি শিল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। প্রসঙ্গত পাথরকে এই শিল্পে বলা হয় 'মেডিকেল' অর্থাৎ জরির মেডিকেল হল পাথর। যে সব পাথর এই শিল্পে ব্যবহৃত হয় সেগুলি হলো—

১. শিরামিক্স—৩, ৪, ৫ ও ৮ নং পাথর।
২. L.C.D—৩, ৪, ৫, ৬ ও ৮ নং পাথর।
৩. টাকলা পাথর—৩,৪,৫,৬ ও ৮ নং পাথর।
৪. চাকি পাথর
৫. ধান পাথর—৪/৬, ৮/৫
৬. রাম্ব পাথর—৪/৬, ৮/৫
৭. স্টান পাথর—৮, ১০ ও ১২ নং পাথর।
৮. কাট দানা—১৪.০, ১২.০
৯. চিড় পাথর—১৪.০, ১২.০
১০. মতি—(অ) সাদা মতি—২.৫, ৩ ও ৪ নং
(আ) গোল্ডেন মতি—২.৫, ৩ ও ৪ নং
১১. দুদিয়া চিড়—১২.০, ১৪.০
১২. সলমা—
১৩. দপকা—
১৪. বুইলেন—
১৫. কিরকিরে—
১৬. টিকে—(অ) প্লেন টিকে—৩, ৪ ও ৫ নং